লোকসংগীত সন্ধান

খালেদ চৌধুরী

লোকসংগীতের চর্চা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে শুরু হয় গত ২৫ বছর ধরে। তার আগে এর চর্চা হত ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সেই সময়ে দীনেশ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— এঁরা কিন্তু লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। এঁরা ঠিক লোকসংগীতের সাংগীতিকতার কথা ভেবে কিন্তু এর চর্চা করেননি। লোকসাহিত্য নিয়ে কাজ করতে গিয়েই তাঁরা লোকসংগীতের খনির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সেই রতনভাণ্ডারের কিছু কিছু রত্ন তুলে রেখেছিলেন তাঁদের সংগ্রহে।

এরপর গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারী আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কারের কাজের প্রয়োজনে কিছু লোকসংগীত সংগ্রহ করে। ব্রতচারী আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে। সেজন্য আয়ত্ত করতে হয়েছিল লোকভাষা। লোকভাষা আয়ত্ত করতে গিয়েই তিনি লোকসংগীত সংগ্রহের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। শুধু লোকসংগীতই নয়, লোকনৃত্য, লোকশিল্প —সবই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সযত্নে। পরবর্তীকালে লোকসংগীতগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্মলেন্দু ভৌমিকের সম্পাদনায় শ্রীহট্টের লোকসংগীত নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। গুরুসদয় দত্ত এগুলো রেখেছিলেন একেবারেই আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায়। কিন্তু স্বরলিপি ছিল না। তিনি সুর সংগ্রহ করে ব্রতচারীর লোককে শিখিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহগুলি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। তিনি লোকসংগীতকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি লোককে এ ব্যাপারে ভীষণভাবে উদ্যোগী করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। নিজেও লোকসংগীতের সুর ও ভাব নিয়ে বহু গীত রচনা করেছেন।

এরপর এল আমাদের যুগ। আমি মানুষ হয়েছি গ্রামীণ পরিবেশে। লোকসংগীতের ক্ষেত্রে ওটাই আমার নেপথ্য ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। আমার বাড়ি ছিল নদীর পারে। গ্রামীণ মেয়েলি গান, পদ্মপুরাণ, ভাটিয়ালী, বাইচ, ধামাইল, সারি, ব্রত, বিচ্ছেদের গান—এগুলি গ্রামে থাকতে বহুবার শুনেছি। বিচ্ছেদের গান সাধারণত গাইত ভিখারিনীরা। খঞ্জনী বাজিয়ে রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিরহের গান গাইলেই মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হত। এই গানগুলি মূলত বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গীভূত। আবার কখনও শুনতাম ছাদ পেটানোর গান। এটার সঙ্গে নৌকা বাইচের গান কিছুটা মেলে। দুটি শারীরিক কসরৎ আলাদা। একটাতে মুগুর দিয়ে ছাদ পেটানো চলে। অপরটায় বৈঠা বাওয়া। তাই ছন্দ ও ঝোঁক একটু আলাদা। একটায় রয়েছে হৈ হৈ----------(নৌকো বাইচ)। অপরটায় শুধু হেই (ছাদ পেটানো)। এগুলি আসলে সবই সারিগান অর্থাৎ বৃন্দগান। এগুলি সবই ত্রিমাত্রিক বা চতুর্মাত্রিক।

ভাটিয়ালীরও প্রথম অভিজ্ঞতাও হল ঐ গ্রামে। নৌকো করে যাচ্ছিলাম, একটা গান ধরেছে মাঝি। তালের ব্যাপার নেই। মঝে মাঝে তামাক খাচ্ছে। আবার গাইছে। সেই প্রথম ভাটিয়ালী সুরের অভিজ্ঞতা। পরে শুনতে শুনতে দেখেছি ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তু দর্শন -সংক্রান্ত। এগুলি একক গান। সারি বা যুথবদ্ধ গানের পরিণতিই কিন্তু একক গানের সুর। জীবনের মধ্যে যতই জড়িয়ে পড়তে লাগল ততই সে একা হতে শুরু করল। এসে গেল গভীর তত্ত্ব। প্রথম যখন গান শুনতাম তখন অবশ্য এসব গানের আলাদা আলাদা চরিত্র সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। ছোট বেলায় আমার একটা বাঁশি ছিল। ইস্কুলে যাবার আগে ওটা বাজাতে বাজাতে যেতাম। ইস্কুল ঢোকার আগে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখতাম। এই বাঁশিতে ছোটবেলায় প্রথম যে গান তুললাম সেটা একটা মেয়েলি গান। গানটি হল 'জলের ঘাটে বাঁশি বাজায় গো কমলা আমরা জলে যাই'। অনেক পরে ১৯৬৫ সালে খাঁটি লোকসংগীত সংগ্রহের জন্য আমরা যে ইনস্টিটিউট করেছিলাম — 'ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' সেখানে কাজ করতে গিয়ে জেনেছি এটা মেয়েদের গান।

এই যে মেয়েলি গান, ব্রত, এগুলি শুনলে পুরুষরা পালিয়ে যেত। কারণ মেন কিছু শ্রুতিমধুর ছিল না। এসব গান, কারণ মেয়েরা গান গাইত দল বেঁধে। এদের মধ্যে গান জানত হয়ত একজন। বাকি সকলে গলা মেলাত। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে এসব গান ঢুকে পড়েছিল। সংরক্ষণের কাজে মেয়েরাই পটু। লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি— একথা বলেছেন গ্রিয়ার্সন। তিনি ভোজপুরী ভাষার কাঠামো ধরতে পারছিলেন না। গেলেন ঐ অঞ্চলের মেয়েদের কাছে। তাদের মুখ থেকে লোকসংগীত শুনে বার করলেন ভাষার কাঠামো।

যাক এতক্ষণ আমার শৈশবের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলাম। পরবর্তীকালে আমি যখন বড় হয়েছি তখন শহরে এসে দেখলাম কিংবা জানলাম - গানের অন্যান্য শাখা, উচ্চাঙ্গ সংগীত, রাগপ্রধান, গজল এগুলি যথেষ্ট উর্বর। এইসব ক্ষেত্রে দিকপালরা রয়েছেন। কিন্তু লোকসংগীত অনাথ। এখানে কেউ নেই। তাই যে যা খুশি করে চলেছেন। এক্ষেত্রে অরাজকতা, এখানে ভুল ধরবার উপায় নেই। কারণ এর কোন স্বরলিপি নেই। তখনি লোকসংগীত অবিকৃত অবস্থায় সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে শুরু করলাম। এবং ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্বরলিপিও করতে শুরু করলাম। আরম্ভ হল অবিকৃত অবস্থায় লোক সংগীতকে সংগ্রহের কাজ। সংগ্রহ করতে গিয়ে যা বুঝেছি বা জনেছি সেটাই অল্প কথায় বলছি।

ভাদুগান সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে তাদের প্রকাশভঙ্গি তাদের মত। এটা কোন Dialect নয়। এটা লোকভাষা। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন এটা Dialect। এই ভাবে লিখে দিলেই বোধহয় গ্রামীণ গান হয়ে গেল। এই জাতীয় অভিজ্ঞতায় আই পি টি এ-র আমলে দেখেছি এসব গান কখনও মানুষের মধ্যে পৌঁছয় না। শোনে, কিন্তু তারা সে গান গায় না। তারা তাদের মত করে দুঃখ বেদনা প্রেম বিরহে'র গান গায়। এমনকি কোন ঘটনা ঘটলে সেটা নিয়েও গান বানাতে দেখেছি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ডিভি সির বাঁধ বসেছে। হাইড্রো ইলেকট্রিকের বাঁধ দেখে মুগ্ধ। গান লিখল—

ডি ভি সি-র লোক কত সেয়ান
পাথর কেটে খয় করে
ধারে ধারে বিজল বাতি
ফোকলে জল পাস করে।

এখানে 'পাস' এই ইংরেজি শব্দও ঢুকে পড়েছে। এই গানটা লিখছে কে? একটা গ্রামের মেয়ে। সে বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। ওরই লেখা আর একটি গান বলছি। তাদের বাড়ির কাছে পোড়াডিহা বলে একটা জায়গা —যেখানে বীরভূম, বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া মিলেছে। সেখানে একটা ভ্যানগাড়ি অর্থাৎ ডাকগাড়ি—যারা ডাক নিয়ে আসে রেল থেকে—ঐ ভ্যানগাড়ি উল্টে যায়। এই ভ্যানগাড়িগুলি

ফেরার পথে দু-পয়সা কামাবার জন্য লোক নিয়ে যায়। যাই হোক—ঐ লোকসমের একটি ভ্যানগাড়ি উল্টে যায়। লোক আহত হয়। ত্রেন দিয়ে গাড়ি তুলতে হয়। এটা তার কাছে একটি ঘটনা। সে গান লিখল—

কটা বাজল ঘড়ি, পোড়াডিহায় উল্টে গেল ডাকগাড়ি
বাঁকুড়াকে খবর গেল গো আইল দুটো ভ্যানগাড়ি,
দেখে শুনে বইতে নারি মন
হইল ভারি ভারি।

গানটি কিন্তু এখানেই শেষ। কোন Pretention নেই। বেশি কথা বলার নেই। এই হচ্ছে তার কথার ভঙ্গি। এখানে যদি তাকে দিয়ে বড় বড় কথা বলানো হয়, স্বদেশপ্রেমের কথা বলানো হয়, তা হয়ে যাবে আরোপিত। স্বদেশপ্রেম সেও বোঝে। তার মতন করে বোঝে। এই তার মতন করে বোঝা—এটা কিন্তু গ্রামীণ সাহিত্যেও সত্য, গ্রামীণ ভাষাও সত্য। যেমন ভাদুগানের ভাষায় রামায়ণের কাহিনী কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। ওরা পূর্বাপর রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করে না। রাম যেন তাদের ঘরের ছেলে। ছেলে বিদেশে গেলে যা হয় তাই চলে আসে কাহিনীতে। শুরু হয়—

রাম নাকিরে বনে যাবিরে
মাথায় দে সোনার টুপি
একলা যাইতো দিব নাইরে
সঙ্গে দু'জন লোকে লিপি

তারপর এমনভাবে বর্ণনা শুরু হয় যেন ছেলে বিদেশে যাচ্ছে। আবার যেমন আছে :

অশোক বনে পাতের কুঁড়া সীতা পাশা খেইলেছে,
যোগ্‌গীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরে নিয়েছে

অশোক বনে সীতার পাশা খেলা কিন্তু রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে মেলে না। আর যোগীর বেশে রাবণের সীতাহরণ ঘটেছে পঞ্চবটীতে। এখানে সেটা হয়ে গেছে অশোকবন। কাজেই ভুগোল-টুগোল সব উল্টে পাল্টে গেছে। আসল কথা রাবণের সীতাহরণ করার কথা বলা আর সীতার সময় কাটে না এটা বোঝানো। সেটা বোঝানো তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে। বোঝোলেই হল। মূল রামায়ণের সঙ্গে মিলছে কি মিলছে না— তাতে তাদের যায় আসে না।

এই গ্রামীণ স্তর থেকে লোকসংগীতকে সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায়শই এর বিকৃতি ঘটছে। বিকৃতি ঘটছে কথায়, বিকৃতি ঘটছে সুরে। কখনও ইচ্ছাকৃত। লোকভাষাকে ফেলে দিয়ে গানকে শহুরে করে তোলার জন্য ব্যবসায়িক কারণে মার্জিত করা হচ্ছে। কখনও ডায়ালেক্ট না বুঝে নিজের কথা বসিয়ে দেবার জন্যও বিকৃতি ঘটছে। অর্থাৎ অজ্ঞতার কারণেও বিকৃত হচ্ছে।

লোকসংগীতের বিকৃতি প্রসঙ্গে অসংখ্য নমুনা দেওয়া যায়। এখানে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। পাঠক সাধারণ এই দুটি গান সম্পর্কে সম্যক পরিচিত। একটি গান 'নিশীথে যাইও ফুলবনে' এবং অন্যটি 'সোহাগ চাঁদ বদনি ধনি'। তখন বোধ হয় ১৯৪০ কিংবা ৪১ সাল। 'নিশীথে যাইও ফুলবনে' সবে বেরিয়েছে এবং বাজার মাত করেছে। সিটেল শহরে (বর্তমান বাংলাদেশে) অবস্থিত মুসলিম সাহিত্য সংসদের অধিকর্তা নুরুল হক সাহেবের সঙ্গে নানা কথার পর এই গানটির প্রসঙ্গ উঠতে তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন : জানেন এটি আসল গান নয় আসল সুরও নয়। কলকাতার কবি জসীমউদ্দীন এসে আমার কাছ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মারীফতি কবি শেষ ভানুর পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিয়ে গেলেন এবং আর ফেরত দিলেন না। আসল গানটি দেহতত্ত্বের। জসীমউদ্দীন সেই গানটিকে প্রেমের গান বানিয়ে শচীনদেবকে দিয়ে রেকর্ড করিয়েছেন। তিনি তাঁদের মুখপত্র ''আল্ ইসলাহ্'' এক কপি বার করে মুদ্রিত গানটি দেখালেন। গানটি নিম্নরূপ :

নিশীথে যাইও ফুলবনেরে ভোমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে
নয় দরজা করি বন্ধু,
লহও ফুলের গন্ধ হে
অন্তরে জপিও বন্ধের নাম রে ভোমরা।
জ্বালাইয়া দিলের বাতি
(ওমন) ফুটা ফুল নানা জাতি হে
কত রঙ্গে ধরবে ফুলের কলি রে ভোমরা।
অধীন শেখ ভানু বলে
ঢেউ খেলাইও আপনি দিলে হে
পদ্ম যেমন ভাসে গঙ্গার জলে রে ভোমরা।।

এতে আরও দু একটি পদ ছিল এখন আমার স্মরণে নেই। গানটির সুর চতুর্মাত্রিকে ছিল এবং খুব সহজ সুর। দ্বিতীয় গানটির সংগ্রাহক শিলচরের শ্রীমুকুন্দ দাস ভট্টাচার্য। পেশায় তিনি নৃত্যশিল্পী। অতি বৃদ্ধ এক মহিলার কাছ থেকে তিনি এই গানটির সুর বাণী ও নাচটি শিখেছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি আমাদের ইনস্টিটিউটে নাচটি দেখিয়েছিলেন এবং গানটিও রেকর্ড করে দিয়েছিলেন। গানটি আমাদের সংগ্রহে আছে। একজন শিল্পীকেও তিনি এই গানটি শুনিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই শিল্পী সেই গানটির কথা ও সুর বদলে রেকর্ড করে দিলেন। সঙ্গে একটা সঞ্চারীও জুড়ে দিলেন বেশ বেখাপ্পা আধুনিক ধাঁচের সুর লাগিয়ে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল লোকসংগীতে স্থায়ী ও অন্তরা থাকে। সঞ্চারী কদাচিৎ থাকে। গানটি বিখ্যাত বউনাচের গান। যেটি এক সময় খুব আলোড়ন তুলেছিল কলকাতা শহরে। মজার ব্যাপার হল, বউনাচের এ পর্যন্ত ঐ একটি মাত্র গান পাওয়া গেছে। গানটি সিলেটি ভাষায় :

সুয়াগ চান্দ বদনি ধনি নাচত দেখি
বালা নাচত দেকি, ভালা নাচত দেকি।।
(এগো) যেমনি নাচইন নাগর কানাই,
তেমনি নাচই রাই
একবার নাচিয়া বুলাও চাইন দেকি নাগর কানাই,

(এগো) নাচিতে আতের বাশি রাখইন শামরায়
(এগো) চাইর দিকে চাইয়া রাইও বাশিটি লুকাইন।।
(এগো) নাচইন বালা সুন্দরীয়ে পিন্দইন ভালা নেতা,
(যেন) এলিয়া দুলিয়া পড়ে সুন্দিজালির বেত
বালা নাচত দেখি।

এর সঙ্গে পাঠকরা আপনাদের শোনা গানটি মিলিয়ে নিলেই বুঝতে পারবেন যে শুধু সুর ও কথা নয়, শহুরে মানুষের কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে গানের শেষ দুটো লাইনের গ্রামীণ চিত্রকল্প স্বচ্ছ আবরণে মুখ ঢাকা সজ্জিত বালিকা বধুর নাচকে তুলনা করা হয়েছে দখিনা বাতাসে আন্দোলিত সুন্দি বেতের ঝাড়ের সঙ্গে। হেলিয়া দুলিয়া শুধু নাগেশ্বরের ফুল পড়বে কেন, কৃষ্ণচূড়া, রাঙাজবা ইত্যাদি চার অক্ষরের মিলযুক্ত যে কোন ফুলই তো উপর থেকে পড়লে হেলিয়ে দুলিয়া পড়বে, তার সঙ্গে বধূর নাচের দোলার চিত্রকল্প কোথায়? তাই এখন থেকে নয়, চল্লিশ দশক থেকেই শহুরে মানুষের কাছে লোকসংগীতকে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে মার্জিত করে পণ্য করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, বর্তমানে রেডিও এবং টিভির আকর্ষণে এক শ্রেণীর গ্রামীণ গাইয়ের কথা বাদ দিলে গ্রামের লোক কখনো শহরের লোককে তাদের গান শোনাবের জন্য লালায়িত নয়। ১৯৭১ সালে জসীমউদ্দীনের কাছে যখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনারা লোকসংগীতকে যথাযথ অবস্থায় রেকর্ড করলেন না কেন? মার্জিত করলেন কেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন : 'দেখেন আমরা যদি কিছুটা মার্জিত না করে রেকর্ড করতাম তাহলে তো শহরের মানুষের কাছে কস্কেই পেতাম না' ইত্যাদি। এরপর আর এক ধরনের লোক আছেন যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে লোকসংগীত ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সংগ্রহ করেন এবং পরিবেশনও করে থাকেন। তাঁরা আবার অনেকে দেখাতে চান লোকসংগীতের শৈলী কত উন্নত তাই ভাটিয়ালিতে কোমল গান্ধারের উপর এমন ঝোঁক দেন, যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পর্দার উপর গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। ভাটিয়ালিতে অথবা ভাওয়াইয়াতে কোমল গান্ধার নেই। যেটা আছে, সেটা গান্ধারের শ্রুতি 'ক্রোধ'। গ্রামীণ লোকেরা শ্রুতি তো দুরের কথা। সারেগামাও জানেন না কিন্তু নিজের মত করে যন্ত্রে সুর বাঁধেন। নিজেদের বিশেষ প্রকাশভঙ্গিতে বেসুরোকে বলেন 'উন্‌সুরা' অর্থাৎ 'ঊন' সুর-সুর থেকে একটু কম। অথবা যন্ত্র ঠিক সুরে বাঁধা না হলে বলেন 'দশমীতে ঠিক লাগেনি' ইত্যাদি। শ্রুতি পরম্পরায় তাঁরা গান শেখেন এবং গান। জিজ্ঞেস করলে বলতেও পারবেন না কোন পর্দায় গাইছেন। কাজেই লোকসংগীতে বিকৃতি শুরু হয়েছে যেদিন ভদ্রলোকরা লোকসংগীতকে উদ্ধার করতে শিক্ষিত মানুষের কাছে পরিচিত এবং গ্রহণযোগ্য করার ব্রত নিয়েছেন, সেইদিন থেকে। শুধু সুরের ক্ষেত্রে নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। গ্রামীণ লোকেরা যখন অন্ধকারকে 'অন্ধক্কার' বলেন, তাতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের চিত্রকল্প তৈরি হয়। 'বাপো যাও মোর দুরাচার' না বলে বলছেন 'দূর আরে চার' অথবা 'দেখে দেখে ষোল বাজে লিলজয় বন্ধু আমায় দুখ দিলে হৃদয়মাঝে' এখানে নির্লজ্জ না বলে 'লিলজয়' এবং 'দুরআরেচার' বলেছেন নেহাতই ছন্দ এবং মাত্রার প্রয়োজনে।

আবিকৃত লোকসংগীতের প্রথম রেকর্ড রহমতউল্লাহ অ্যান্ড পার্টির গাওয়া দুটি গান ''দ দে কানাইয়া লালা বসন আমার হাতে দে" এবং ''তুই আমার চাঁদের কণা আঁধার করে কই গেলি লো।' Twin Record F.T. 674 । এই তথ্যটি জানালেন কবি জসীমউদ্দীন ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে ১৯৭১ সালে। এরপর অনেকে অবিকৃত লোকসংগীতের রেকর্ড করেছেন। যথা আব্বাসউদ্দিন, কেশব বর্মণ, কেদার চক্রবর্তী, ধীরেন সরকার, নায়ের আলি, যত্নেশ্বর বর্মণ, সুরেন্দ্র বাসুনিয়া, প্রতিমা বড়ুয়া, অনন্তবালা বৈষ্ণবী এবং শচীনদেব বর্মন। শচীন দেব কখনও নিজেকে লোকসংগীত গাইয়ে বলে দাবি করেননি। অথচ তাঁর গানের মধ্যে লোকসংগীতের মেজাজ অক্ষুণ্ণ।

লোকসংগীতকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারটি আমার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেন গুরুত্বপূর্ণ, সেটা পরে বলছি। যাই হোক অবিকৃত রাখার প্রয়োজনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খাঁটি গ্রামের মানুষের মুখ থেকেই শুনেছি। গ্রামীণ লোকের মুখ অনেক সময়েই আমি গ্রামের বয়স্ক মানুষটির কাছ থেকেই শুনেছি। গ্রামীণ লোকের মুখ থেকে সংগ্রহ করার সময় এমন লোকের কাছে যাওয়া উচিত যিনি ভিডিও টেপরেকর্ডার দ্বারা আক্রান্ত হননি। নন-পলিউটেড রয়েছেন। টেপ করে তাঁর মুখ থেকেই ধরে রাখতে হবে। কোন শব্দ বোঝা না গেলে কখনই নিজের বানানো শব্দ বসানো উচিত নয়।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি নিজে বানাতে গেলে অনেক ভুল হয়। এটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। যেমন একবার টেপ করে অনলাম-

লাল মাগচা পড়ে রইল মালীর বাগানে
বায়েন দাদা ঘুমাই গেছে নব যৈবনে।

কিছুই আমি বুঝতে পারছি না — মালীর বাগানে লাল গামছা কেন? গানের মাঝে কিছু বোল আছে। থেইয়া কেটে থেইয়া কেটে ইত্যাদি। যাই হোক, পরে অনেক চেষ্টা চালিয়ে জানলাম কথাটা ঢোল ধামসা পড়ে রইল। অর্থাৎ বায়েনের ঢোল। আমি গানটি টেপ করার পর ঐ অঞ্চলেরই একজনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি গানটি টেপ থেকে লেখার সময় লিখেছিলেন —'লাল গামছা'। তিনি বুঝতে পারলেন না। কারণ তিনি ভদ্রলোক হয়ে গেছেন। যাই হোক, আমি ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত সঠিক শব্দ পেয়ে গেলাম। আরেকটি গান, আমি শুনছি ''পেট ভরা যৈবন রয়েছে তার হাতে।" কিছুতেই বুঝতে পারছি না —পেট ভরা মানে কি? একটি বাচ্চা ছেলের কাছ থেকে গানটি তুলেছিলাম। কথাটার মানে বুঝতে না পেরে আবার তার কাছে যাই। তখুন সে বলে 'পেট অভরা যৈবন' —বাবু। আমি বললাম তার মানে? ও বলল —ভরাপেট থাকলে যেরকম লাগে সেরকম যৈবন। এই হচ্ছে লোকভাষা। গ্রামের ভাষা। পরিপূর্ণ যৌবনের প্রকাশভঙ্গি কোন শহুরে মানুষই ভরাপেটের উপমা দিয়ে করবেন না। এই প্রকাশভঙ্গিটাই কিন্তু লোকভাষার প্রাণ। সংগ্রাহককে এই প্রকাশভঙ্গিকে বুঝতে হবে। আমরা শহরের মানুষ হয়ত শীতের কবিতা লিখতে গিয়ে বলব— 'শীতে কাঁপে কলেবর থর থর থর'— গ্রামের মানুষের প্রকাশ কিন্তু অন্য। সে বলছে—

'যার কাপড় তার জাড়
লিকাপইড়্যার পাথর আড়'

অর্থাৎ শীত তারই যার কাপড় রয়েছে। গরিবের কাপড় নেই। পাথরের আড়াল দিয়েই সে শীতকে প্রতিরোধ করছে।

এবার আসি গ্রামীণ সুর প্রসঙ্গে। গ্রামীণ সুর শুনেই বোঝা যায় এটা ভাটিয়ালী, এটা ধামাইল, এটা বাইচ, এটা মেয়েদের গান। কেননা প্রতিটি সুরের কাঠামো আছে। এই সুরের কাঠামো কিন্তু তৈরি হয় এক একটা অঞ্চলের নিজস্ব ভৌগোলিক কারণে। একটা জলীয় জায়গা যদি থাকে— যেখানে বারোমাস জল থাকে সেখানে সুরের গঠন এক রকমের। ঐ অঞ্চলের সাতরকমের গান থাকলেও

সুর হবে ঐ একটা কাঠামোর উপর। শুধু বিষয়বস্তু পাল্টাবে তালে একটু হেরফের হবে। কিন্তু সুরের মূল কাঠামোটা থেকে যাচ্ছে। পূর্ব বাংলা নদীমাতৃক। প্রচুর জল। সেখানে ভাটিয়ালী টানা সুর। কিন্তু যখন জল শুকিয়ে যায় তখন ঐ গান পাল্টে যায়। সুর টানা থাকে না। গানের ঢং পাল্টে যায়। গান গাওয়া হয় ছন্দে। কিন্তু সুরের কাঠামো ঠিক থাকে। শুধু গায়কী পাল্টে যায়। একটা ছিল টানা। যেই জলে চলে গেল, এসে গেল তাল। এলে গেল যন্ত্র। একে বলে 'চালি' তে দিয়ে গান গাওয়া।

আবার পাহাড়ি অঞ্চলে যে পদার্থগুলির অনুরণন হয় সেগুলি দিয়েই গান হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ পাহাড়ী অঞ্চলে পাঁচ পর্দা দিয়েই সুরের কাঠামো তৈরি হয়। ধ্রুপদীতে একে বলা হয় ঔড়ব জাতীয়।

খুব বড় ধরনের সুরের বৈচিত্র্যে গ্রামের মানষ যায় না, যেমন ভাটিয়ালী একটা সুরের কাঠামো। তার থেকেই তৈরি হচ্ছে সারিগান, ধামাইল, বাইচ, মেয়েদের গান। সবগুলির সুরের কাঠামো কিন্তু ভাটিয়ালী। পর্দা বিশ্লেষণ করলেই তা দেখা যায়। ধামাইল ত্রিমাত্রিক ছন্দে। মেয়েলি -নাচ ঘুরে ঘুরে। ত্রিমাত্রিক ছন্দ বাইচেও আছে। বাইচে শারীরিক কসরত আছে। তার অ্যাকসেন্ট আলাদা কিন্তু পর্দা একই। ত্রিমাত্রিকে অ্যাকসেন্ট আলাদা বলে ওটা বাইচ। আবার নাচ, উচ্ছলতা বেশি বলে ওটা ধামাইল। তেমনি উত্তরবঙ্গে সমস্ত গানের সুর পাচ্ছি ভাওয়াইয়াতে। ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া গানের কাঠামোতে ব্যবহৃত পর্দা এক। দু ক্ষেত্রেই মুদারার 'না' কোমল বাকি সব পর্দা শুদ্ধ। তবে স্বরগুচ্ছ (Melodic Grouping) আলাদা। ভাওয়াইয়াতে মুদারার কোমল 'না' হচ্ছে উপরের পর্দা কদাচিৎ তারার 'রা' লাগে এবং খাদে উদারাতে 'পা' পর্যন্ত নামে কিন্তু ভাটিয়ালীতে ওপরে তারাতে মধ্যম পর্যন্ত তো যায়ই বরং ক্ষেত্র বিশেষে আরও ওপরে পর্দার ব্যবহার দেখা যায় এবং উদারাতে খাদে 'ধা' হচ্ছে শেষ পর্দা। এ ছাড়াও আরও একটা পার্থক্য হল, ভাটিয়ালীতে তান-এর ব্যবহার আছে, অলঙ্কার আছে প্রচুর। ভাওয়াইয়াতে অলঙ্কারের ধরন ভিন্ন এবং তান এর ব্যবহার কদাচিৎ। এদিক থেকে ঝুমুরের সুর কাঠামো স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র। যেহেতু ঝুমুরের উৎপত্তি স্থল ছোটনাগপুর অঞ্চল এবং ঐ অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতি মুন্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, ভীল ইত্যাদি। এদের ঝুমুরের মূল কাঠামো ছিল আদিতে চার পর্দার। ওরা যেমন ছড়িয়ে পড়ল বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ওড়িশা, এবং বাংলার সিংভূম, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি এবং আসামের চা বাগান অঞ্চলে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঝুমুর গান উপরিউক্ত অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর গানের সঙ্গে মিশে রূপান্তরিত হল। ওদের মূল চার পর্দার গান স্থান বিশেষ পাঁচ, ছয় এমনকি সাত পর্দাতেও গাওয়া হতে লাগল। ফলে এখন ঝুমুর গানের কাঠামো একটির বদলে একাধিক হয়ে গেল। আসানসোল, রানীগঞ্জ অঞ্চলে তো রীতিমত মার্জিত ঝুমুরের প্রভূত প্রচলন আছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে আদিরস থেকে আধ্যাত্মিক রস পর্যন্ত এর পরিধি। কাজেই কাঠামোর দিক থেকে বিচার করলে এখন এটাকে মুন্ডা ঝুমুর, সাঁওতাল ঝুমুর, ওরাওঁ ঝুমুর, বাউড়ী ঝুমুর এইভাবে দেখা ভাল। আসামের চা বাগানে গিয়ে তো ঝুমুর বিহু গানের পাঁচ পর্দার সঙ্গে মিশে ভিন্ন রূপ নিয়েছে। ঝুমুরেও ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালীর মত কোমল 'না' অপরিবর্তিত এমন কি মানভূম অঞ্চলে কোমল 'না' এবং কোমল 'জ্ঞা' ব্যবহার ও ভিন্ন রূপকাঠামোর পরিচায়ক।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের ফলে যেমন সুরের কাঠামোর বৈচিত্র্য ঘটে তেমনি বৈচিত্র্যের আরেকটি কারণ হল ভাষার ধ্বনিগত পার্থক্য। অর্থাৎ Phonetic Sound পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চলের গান হচ্ছে ভাটিয়ালী। শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল —এই গোটা অঞ্চল হল ভাটিয়ালীর। এর মধ্যেও ইতর-বিশেষ আছে। যেমন শ্রীহট্টের থেকে চট্টগ্রামের সুর আলাদা। অবার চট্টগ্রামের থেকে মনমনসিংহের সুর আলাদা। কারণ ভাষার ধ্বনিগত পার্থক্য। আমরা শুনতে শুনতে বুঝি এটা ময়মনসিংহের ঢং, এটা চট্টগ্রামের ঢং, এটা ঢাকাই ঢং, এটা শ্রীহট্টের। এই বোঝার জন্য দরকার শুনে শুনে কানকে তৈরি করা। যেমন একটা সুরের কাঠামো থেকে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের গান। ভাওয়াইয়ার মধ্যে যেগুলি চটুল সেগুলিকে বলি চটকা। আবার মধ্যে হালে ঢুকছে পরলোক চর্চা। এগুলিকে বলা হয় 'তুক্‌খা'। ভাওয়াইয়া সুরে আমরা পাচ্ছি পালা , চটকা, খন, কুশাণ গান। তেমনি পশ্চিমবাংলায় 'ঝুমুর'। এইভাবে তিনটি 'মিউজিক্যাল রিজিয়ন'—এ ভাগ করা যায়। আবার পরিবেশ পাল্টে যাচ্ছে অসমে। সেখানে আসছে 'বিহু'। অর্থাৎ ভাষা, পরিবেশ, ভূগোল, আচার, আশা আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই নির্ণয় করে সুরের কাঠামো। লোকসংগীতের এই যে আঞ্চলিক চরিত্র—এটাই ওর প্রাণ। এইখানেই সে বেঁচে যায়। কোন কারণে লোকসংগীত যদি আটকে থাকে সেটা কিন্তু সামাজিক কারণ, এর সৃজনশীলতা কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ। তবে আজ গ্রামের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। মানুষ শহরের দিকে ছুটছে। দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। এই সামাজিক জীবন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে বলেই কালচারকে সে ধরে রাখতে পারছে না। উল্টোপাল্টা হচ্ছে মিশ্রণ ঘটছে। আর এরই সুযোগে কিছু শহরের ব্যবসায়ী মানুষ গান লিখে লোকসংগীত বলে চালিয়ে দিচ্ছে। তবে একটা কথা, প্রত্যেক মানুষকেই যেতে হয় তার শিকড়ে। আজ আমরা লোকসংগীতের মধ্যে দশরকমের সুর মেশাচ্ছি। জাপানী, ইংরেজী, কিংবা জার্মান সংগীতের সুর। ফলে লোকসংগীতের চরিত্র হারিয়ে যাচ্ছে। বিকৃতি ঘটছে। একদল চিৎকার করে লোকসংগীত Stagnant হয়ে গেছে। তাই বৈচিত্র্য দরকার, Stagnancy বলতে এরা কী বোঝাতে চাইছেন? ধরা বাঁধার বাইরে কোন কথা নেই এটা বলতে চাইছেন না সুরের বৈচিত্র চাইছেন। এঁদের জেনে রাখা দরকার—লোকসংগীত কিন্তু শহরের মত দৌড়বার পক্ষে নয়। নিত্যনতুন ভোগ্যপণ্যের মত নয়। আজকে সূতার বস্ত্র পরলাম, কাল টেরিলিন, পরশু টেরিকট। লোকসংগীতের কাজ শিকড় নিয়ে। প্রতিটি মানুষের জীবনে একসময় শিকড়ে যাবার দরকার হয়। জাতির জীবনে হয়।

এই আত্মসন্ধানের প্রয়োজনেই কিন্তু লোকসংগীতকে অবিকৃত রাখা দরকার। এই প্রাকৃত অবস্থাতেই তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। আমার সংগীতের শেকড় এই লোকসংগীতে। ক্লাসিকাল সংগীতের উৎপত্তি এই লোকসংগীত থেকেই। সে কারণেই ক্ল্যাসিকাল সংগীতের দুটি ভাগ। উচ্চাঙ্গ ও দেশী। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন প্রাকৃত ও সংস্কৃত। প্রাকৃত ভাষাকে কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বেরিয়ে আসতে পারি না প্রাকৃত জীবন থেকে বেরিয়ে আসা মানেই জীবন থেকে অবধারিত বিচ্যুতি।

সৌজন্য : (প্রেমেন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত) লৌকিক উদ্যান/ প্রসঙ্গ লোকসংগীত (১৯৯৮) U.B.I স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, কল —৭৫।